



অভাগিনীর অঞ্জলে ধূসর মরণে প্লাবন

বনি আমিন

স্মষ্টা তার আদমভুবন সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি সর্বত্র মাইগ্রেশন [হিজরত] লেগেই আছে। ধর্ম মতে পৃথিবীতে প্রথম মাইগ্রেশন পেয়েছিলেন শ্রীমান আদম ও তার জীবন সঙ্গিনী শ্রীমতি হাওয়া। তারা মাইগ্রেশন পেয়েছিলেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। আত্মাভিমানি দেবদুতদের ষড়যন্ত্রের শিকার এই হতভাগা জুটিকে সৃষ্টিকর্তা অর্ধচন্দ্র দিয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়ন করে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন। কথিত আছে রাবণের লঙ্কা রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত গহীণ অরন্যে আচ্ছাদিত একটি পর্বতে উক্ত জুটি প্রথম অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে অতঃপর পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে তাদের ছেলে হাবিল ও কাবিলকে নিয়ে পৃথিবির পবিত্রভূমি বলে পরিচিত খোর্মা খেজুরের দেশ আরবে তারা মাইগ্রেশন [হিজরত] করে আসেন। তারপর থেকে আদমের বংশবিস্তার চলছে এবং সেই সাথে চলছে মাইগ্রেশন, একপ্রাণ্ত থেকে আরেক প্রান্তে। যেমন ইংরেজরা এসেছিল ভারতে, ভারতীয়রা গিয়েছে ক্যারাবিয়া, আফ্রিকা ও ত্রিনিদাদে, আর তামিলরা (এ্যাবোরোজিন) এসেছিল অঞ্চলিয়াতে, বাংলাদেশীরা আবাদ করেছিল শ্রীলঙ্কা এবং মোঙ্গলিয়ানরা গেছে তুরস্ক, স্ফটল্যান্ড, কানাডা ও সাইবেরিয়াতে। থেমে নেই পৃথিবী এবং যতকাল এই পৃথিবী সৌরজগতে ঘূর্ণায়মান থাকবে ঠিক ততকালই আদম সন্তানরা প্রজন্ম থেকে প্রজানুষ্ঠের ভূপৃষ্ঠের উপর আবর্তিত হতে থাকবে।

শাশ্বত এই মাইগ্রেশন নিয়মটি কখনই নিরন্তর আনন্দময় নয়, হওয়ার কথাও ছিল না। কেউ নিজের স্মৃতিবিজড়িত মার্ত্তভূমি, আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ও স্বজনদের ছেড়ে ভীনদেশে নিরঙ্কুশ আনন্দ পেতে পারে না। ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ [সঃ] সখের বশে মদিনায় মাইগ্রেশন করেননি। অর্থনীতি, শান্তি, নিরপত্তা অথবা আবেগ যেকোন একটি অথবা সমষ্টিগত কারনে একজন আদম সন্তান ঘরছাড়া হয়ে থাকেন। উক্ত কারনে এ্যাবত প্রায় এক কোটি বঙ্গসন্তান জগতের বিভিন্ন দেশে মাইগ্রেশন নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বুকে হাত দিয়ে এবং চোখে চোখ রেখে কোন প্রবাসী বাংলাদেশী শীর উঁচু করে কখনো বলতে পারবেন না তিনি উপরোক্ত কোন কারন ছাড়া দেশের বাইরে এসেছেন। তারপরেও অনেক দ্বিমুখী ব্যক্তিত্ব নির্লজ্জের মত দাবী করেন 'স্বেচ্ছায় নিবাসিত' অথবা নিতান্তই সখের বশে প্রবাসে এসেছেন। এশ্বনীর লোকগুলো দেশের বাইরে এসেই নিজেদেরকে আর্য রক্তধারক অথবা নবাব বংশের অথবা জমিহারা কোন জমিদারের বংশদর বলে দাবী করে থাকেন। দেশে থাকতে এরা সকলেই ধনী ছিল, চতুর্দিকে নওকর ও পাইক পেয়াদায় ঘোরা ছিল এদের জীবন এবং সোনার চামচ দিয়ে রূপার থালা থেকে ভাত নিয়ে খেতেন বলে অহেতুক পেঁচাল পাড়েন। তৎকালীন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাতীর মহম্মদের পূর্বপুরুষরা চাটগাঁ'র দক্ষিনাঞ্চল টেকনাফ [আরাকান রাজ্য] থেকে এসেছিলেন বলে কথিত আছে। সেই সুত্রে ইদানীং সিডনীর কিছু বাংলাদেশী নিজেদেরকে মাহাথীরের বংশধর বলেও পরিচয় দিতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশী কারো উচ্চতা যদি 'পাঁচ ফুট বারো ইঞ্চি'র কাছে হয়ে থাকে এবং গায়ের রঙ একটু ফর্সা হয় তবে তাদের অনেকেই নিজেদেরকে সম্মাট শ্রেণিশাহ অথবা আর্য বংশস্তুত বলেও দাবী করে থাকে। [উল্লেখ্য দিল্লীর নীতিপরায়ন ও চরিত্রবান সম্মাট শ্রেণিশাহ'র মত মহান শাসকও সাম্রাজ্য পরিদর্শনকালীন রাজশাহীতে এসে মুতা-বিবাহ করে এক বঙ্গললণাকে মার্ত্তদের তৃষ্ণি দিয়ে গিয়েছিলেন।] যাদের চোখ কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতির ও কুঁতকুঁতে হয়ে থাকে তারা নিজেদেরকে বেঙ্গুন অথবা মাহাথীরের বংশের সাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। নিজ বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকে তৎকালীন ব্যবসা সমূদ্র রেঙ্গুনে তাদের পূর্বপুরুষদের সওদাগরী বা আড়তদারীর গল্লও ফেঁদে বসেন, যা নিতান্ত হাস্যকর। উক্ত চরিত্রের এ আদমগুলো সুযোগ বুঝে নিজের নামের সাথে বিভিন্ন রকম ফালতু পদবীও জুড়ে নেন। শুনলে মনে হয়, 'ছাল নাই কুত্তা, বাঘা নাম তার'। বাংলার মাটিতে একপ অবাঙালী ধাঁচের বাত্তিরা মূলতঃ অতীত যুগের বহিরাগত লম্পট শাসক ও ধর্ষকামী জলদস্যদের রক্তধারা

বহন করছে বলে অজস্র প্রমাণ আছে। আর সেজন্যে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বিদরা বলেন, ‘বাংলাদেশ ইজ এ মেল্টিং পট অব রেসেস।’ সাধারণত যাদের সত্যিকার অর্থে দেশে কোন পারিবারিক পরিচিতি নেই অথবা প্রবাসে নিজ পেশার পরিচয় দিতে লজ্জা পান অথবা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নিতান্ত অভাব, শুধু এই প্রেনীর লোকগুলোই দেখা যায় প্রসংগহীন অহেতুক ‘সোনার চামচ, রূপার থালা অথবা রেঙ্গুনে’র গল্ল বলতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এমনকি নিকট অতীতে কি প্রকৃয়ায় অথবা কি তেলেছমাতি করে এরা অঞ্চলিয়াতে থাকার অনুমতি পেলেন সেটাও বেমালুম ভুলে গিয়ে এরা বন্ধু বাস্তবদের কাছে নিজের মাইগ্রেশন বিষয়ে বর্ণাচ্য ও এ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনী বলে থাকেন। [উক্ত বিষয়টি পরবর্তিতে বিস্তারিত অন্যকোন প্রতিবেদনে আলোচনা করবো।]

হেমায়েত করিম দীর্ঘ একুশ বছর ধরে অঞ্চলিয়ায় আছেন। শুধুমাত্র একটু অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাধ নিতে তিনি তার সদ্য বিবাহিত ও গর্ভবতি স্ত্রী জুলেখাকে রেখে দেশ ছাড়া হয়েছিলেন। প্রানপত্তি হেমায়েতকে একনজর দেখার অপেক্ষায় গত একুশ বছর ধরে জুলেখা প্রহর গুনছে। তার দীর্ঘদিনের অশ্রদ্ধারাকে কাঞ্চাই হুদ্রের মত বাঁধ দিয়ে যদি হঠাত ছেড়ে দেয়া হতো তবে হয়তো সেই প্লাবনে ভেসে যেত কোন বিশাল জনপদ। হেমায়েত অঞ্চলিয়ায় আসার তিনমাস পর তার মেয়ে সখিনার জন্ম হয়। জন্মদাতাকে ছবিতে দেখেছে, ফোনে কথা বলেছে, দুজনের মাঝে লেখালেখি হয়েছে অনেক, কিন্তু দেখা হয়নি কখনো। গত বছর সখিনার বিয়ে হয়ে গেল এবং চলতি বছরে সে সন্তান সন্তোষ। আর কয়দিন পরে হেমায়েত পিতামহ হবেন, দৌহিত্রিকে দেখবেন ছবিতে, বাস্তবে নয়। জীবিত থেকেও তিনি তার পরিবারের সদস্যদের কাছে ‘ফটো’ হয়ে আছেন। ভাগ্যবিধাতা হেমায়েতকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দিয়েছে বটে তবে তার বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে তার জীবনের অমূল্য অনেক কিছু। অঞ্চলিয়ার বিভিন্ন শহরের বাটুবনের মত সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা সুউচ্চ অট্টালিকার ছায়ায় ও ইটের পাঁজরে লুকিয়ে আছে এরকম



হাজারো বাংলাদেশী হতভাগাদের কাহিনী। যাদের নীরব কান্না কেউ শোনেনা। শারীরিক ক্ষমতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সোনার হরিণের সন্ধানে এসে অনেকে এখানে ‘হিজরতি আইনে’ ফেঁসে গেছেন। অনেকটা বড়শীর উল্টো আলের মত, মশুন হয়ে বিধলেও বের করা কষ্ট। কত হেমায়েত যুগের পর যুগ নিঃসঙ্গ ও বিরহে দিনায়পন করছেন ইষ্টক জঙ্গল এই সিডনী নগরীতে। কঠিন বাস্তবতার এই সন্ধিক্ষণ থেকে মুক্তি পেতে অনেকে তাদের ফেলে আসা স্ত্রীকে নানা কায়দায় অঞ্চলিয়ায় এনেছেন। কেউ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে অথবা ভাইয়ের সাথে বিয়ে পড়িয়েও স্ত্রীকে এখানে এনেছেন। সিডনীর একজন বাংলাদেশী পদস্থ কর্মকর্তা ফারদীন খান, যিনি তার তালাকপ্রাপ্ত একমাত্র বোনকে নিজের স্ত্রী দেখিয়ে অঞ্চলিয়ায় এনেছিলেন। ‘কাগজ’ থাকলে বোনের জন্য হয়তো পাত্র পেতে অসুবিধা হবেনা ভেবে তিনি উক্ত ন্যাকারজনক কাজটি করেছিলেন। পরিবহন কর্মী সগীর উদ্দিন দীর্ঘদিন আইনী প্যাঁচে আটকে থাকা তার আপন ভাইয়ের বিরহ ঘুচাতে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেখিয়ে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করে এনে দিয়েছেন সিডনীতে। অনেকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে অথবা অন্য

কারো ‘ডিপেনডেন্ট’ দেখিয়ে স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসছেন। উক্ত পদ্ধতীটি এখন সিডনী তথা অস্ট্রেলিয়াতে বহুভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যারা নিজের আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্বের সাথে কখনো আপোষ করতে পারেন না তাদের হয়েছে যতকষ্ট। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মত এরা সর্বদা স্যান্ডউইচ হয়ে চেপে থাকে। তাদেরকেই ধুকে ধুকে বিরহের কঠিন উত্তাপ সহিতে হয়।

সম্প্রতি সিডনীতে আগত বাংলাদেশের একটি ব্যান্ডলের সাথে ‘প্রবাসী-বিছিন্ন’ অনুষ্ঠান আয়োজকের স্ত্রী এসে দিনকয়েক ঘুরে গেলেন। সংস্কৃতি সেবক শামসুদ্দোহা বাবলু প্রায় গত নয় বছর ধরে সিডনীতে বসবাস করছেন। যোগ্য পিতা ও দায়িত্ববান স্বামীরা প্রবাসে যা করে থাকেন তিনিও তাদের ব্যতিক্রম নন। উল্লেখ্য, গত দুবছর আগে বাংলাদেশে তার একমাত্র ছেলে গোল্ডেন জিপিএ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। সবার মত সোনার হরিণের আশায় বাবলুও সিডনী এসেছিলেন, অতঃপর জড়িয়ে গেছেন ‘হিজরতি আইন’-এর গেঁড়াকলে, দেশে ফিরতে পারছেন না। ফেলে আসা একমাত্র সন্তান ও প্রেয়সী স্ত্রীকে একনজর দেখার সুযোগ তার হয়নি দীর্ঘ বিছিন্ন তার অভাগী স্ত্রীকে শুধু এক পলক দেখার জন্যে তিনি সামান্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন বটে। অন্যায় হলেও সেটা আমার কাছে, আমার মতে একটি ‘পৰিত্ব অন্যায়’। নিজের সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত ব্যান্ডশোতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সাথে সত্যিকার পরিচয় গোপন করে তিনি তার স্ত্রীকে সম্প্রতি সিডনীতে বেড়াতে এনেছিলেন। উক্ত বিষয়ে তাকে একান্ত সহযোগীতা করেছিলেন একজন বাংলাদেশী হৃদয়বান ব্যক্তি চৌধুরী শহিদুজ্জামান। বাবলুর সাথে দীর্ঘ যোগসূত্রিতার কারনে স্পন্সর হিসেবে জামান এগিয়ে আসেন। কোন কারনে বাবলুর স্ত্রী তার ভিসায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি অস্ট্রেলিয়া থেকে বের না হতো তাহলে একজন স্পন্সর হিসেবে ধনে ও মানে মারাত্মকভাবে জখম হতেন উক্ত জামান। সিডনীতে অনেক ব্যক্তি অতিতে তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে বেড়াতে এনে স্পন্সরের বুকে ছুরি মেরেছিলেন, প্রমান আছে শত শত। দীর্ঘবিছেন্দ্রের পর প্রনয়নীকে কাছে পেয়ে কার না সাধ হয় আরো দুদিন বেশি কাছে ধরে রাখতে। জানালার আর্শ ভেদ করে আসা প্রভাতের ক্ষীণ আলোতে কঙ্কনের রিনিবিনি আওয়াজ তুলে হাতে এক কাপ চা নিয়ে নিদ্রা জড়নো প্রানপত্রির শিয়রে দাঁড়াতে কার না সাধ হয়। দীর্ঘ বিছেন্দ্র পর সাময়িক মিলনকালে কে না চায় প্রতি রাতে বাসর সাজাতে? কিন্তু সকল সাধ আর আত্মাদকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন বাবলু। তিনি সিডনীতে প্রথমবারের মত একটি নজির সৃষ্টি করেছেন। মাত্র পাঁচদিন পরেই বিদায় দিয়েছেন তার প্রাণ প্রিয়াকে। রানওয়ের বুক চিরে বিকট গর্জন তুলে হাওয়াই জাহাজটি যখন দৌড়াচ্ছিল এবং অবশেষে উড়ে গিয়ে নীল আকাশে ধীরে ধীরে মিলে গেল তখন সে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে তার হৃদয়ে যে ক্ষরণ হয়েছে সে কথা কে বুবৰে। বাবলু জানে না কবে তার স্ত্রীর সাথে আবার দেখা হবে, সাঁঝের জোনাকীর মৃদু আলোতে আঙিনায় বসে কবে আবার মুখোমুখি দুজনের কথা হবে। সকল কিছুই অনিশ্চিত। যেকোন উপায়ে একজন স্বামী অনিচ্ছাকৃত দীর্ঘ বিছেন্দ্র পর ক্ষণিকের জন্যে নিজের স্ত্রীকে কাছে পেতে চাইতে পারে, তাতে যদি সত্যিই অন্যায় হয়, তবে সে অন্যায় কতটুকু? বন্ধুর বিশ্বাসকে মূল্য দিয়ে এবং অস্ট্রেলিয় আইনকে সম্মান করে বাবলু যে কঠিন ত্যাগ স্থিরাক করেছেন তা থেকে অনেকের শিক্ষা নেয়া উচিত।

যে যেভাবেই আমরা এদেশে থাকি না কেন, উদ্দেশ্য আমাদের ভিন্ন নয়। কাউকে আলাদা করে দেখার কোন কারণ নেই, আমরা সকলেই গ্রাম বাংলার সন্তান। যদি খাঁটি বাঙালী হয়ে থাকি তাহলে সকলের গায়ে এখনো কাঁদামাটির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আর্য বর্ণ, নবাবের বংশধর অথবা রেঙ্গনের সওদাগর হলে ভিন্ন কথা।

বনি আমিন, সিডনী, ১৮/০৩/২০০৯